# ‘দ্য টাইরানি অব অ্যাপাথি’:
# ক্রমাগত কয়লা হতে থাকা পোষাক কারখানার মেয়েরা বনাম এক ডীনের ব্যক্তিগত জরিমানা

কাবেরী গায়েন

ইংরেজী ‘অ্যাপাথি’ শব্দের অর্থ ‘indifference’, ‘lack of concern’ বা ‘lack of interest’, যার সোজা-সাপ্টা বাংলা অর্থ করা যেতে পারে অনীহা বা ‘কিছুতেই কিছু যায় আসে না’ পরিস্থিতি। একধরণের বোধনষ্টি (desentisization)। জাতি হিসেবে এই বোধনষ্টি আমাদের কবে শুরু হয়েছিলো সেটি গবেষণার বিষয় হতে পারে তবে এক সামষ্টিক বোধনষ্টির কবলে যে আমরা বহুদিন থেকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের জাতীয় নেতাদের হত্যা থেকে শুরু করে সংবিধানের পঞ্চম আর অষ্টম সংশোধনী, শবমেহেরের মৃতদেহ, আদিবাসী জনপদে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক, পূর্ণিমার লাঞ্ছিত কিশোরী শরীর, রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়া মানুষের একশ টুকরো লাশ, সাকা চৌধুরীর খিস্তি, র‍্যাবের ‘ক্রশফায়ার’, নিজামীর গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা আমরা সব মেনে নিয়েছি, আমাদের কিছুতেই কিছু যায় আসেনা। প্রিয় কবি কবিতা চাকমার মতো মনে হয় না, “জ্বলি না উধিম কিত্তেই?”। আর তিনটি ঘটনা তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যার মতোই নিয়ম কিংবা বলা ভালো প্রায় ‘প্রাকৃতিক’ হয়ে উঠেছে: লঞ্চডুবি, উত্তরে কার্তিকের মঙ্গা আর পোষাক কারখানার শ্রমিকদের (পড়া ভালো মেয়ে শ্রমিকদের) আগুনে পুড়ে বা ভবন ধ্বসে মৃত্যু। লঞ্চডুবিতে এমন কি ছয়শ মানুষও মারা যান, লাশের পাশাপাশি কুকুর-শিয়ালের আনাগোনা, লাশের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে যাওয়ার নিখুঁত বর্ণনা কিছুদিন আমাদের বিচলিত করে নিশ্চয়ই। মঙ্গাঁর বর্ণনা এতো চমৎকার উঠে আসে সংবাদপত্রের রিপোর্টিং-এ যে এক ধরণের মহৎ সাহিত্য পাঠের অনুভূতি বুঝি পাওয়া যায়, যেনোবা দেবেশ রায়ের তিস্তা পাড়ের বিত্তান্ত আর সেইসাথে প্রিয় কলাম লেখক আনিসুল হকের অমর্ত্য সেনকে উদ্ধৃত করে লেখা, ‘যে দেশে গণতন্ত্র আছে সে দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে না’ মনে করিয়ে দেয় এখন কার্তিকের মঙ্গার কাল বটে। আর পোষাক কারখানার ‘দুর্ঘটনা’র পর প্রতিবার কয়লা হয়ে যাওয়া মেয়েদের স্বজনদের আহাজারি আর বিজিএমইএ’র ক্ষতিপূরণ ঘোষণার পর কয়েকদিন কেমন খালি খালি লাগে মাথার ভেতর, কয়েকদিন মাত্র। লাল অক্ষরে ব্যানার থেকে ক্রমাগত ছোট হতে থাকা শিরোনাম ভেতরের পাতায় তারপর পত্রিকা থেকে খসে পড়ার আগ পর্যন্তই এই বোধ, তারপর সব ঠিক হয়ে যায় ফের আগুনে ঝলসানো নতুন খবর না আসা পর্যন্ত। এই তিন ঘটনার মধ্যে আবার সবচেয়ে নিয়মিত হলো পোষাক কারখানার শ্রমিকদের, বিশেষত মেয়ে শ্রমিকদের, আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া বা পুড়ে আধা মরে বেঁচে থাকার পৈশাচিক পুনরাবৃত্তি। আমরা রুখে দাঁড়াই না, রুখে যে দাঁড়ানো দরকার সেই বোধটিও হারিয়ে ফেলেছি। প্রতিবারের মতোই এবারও কেটিএস কারখানায় আগুন লাগার পর রুটিন তীব্র খারাপ লাগা থেকে শুরু করে সপ্তাহান্তে সে বোধ মিলিয়ে যাওয়ার চিরাচরিত মধ্যবিত্ত প্রক্রিয়ায় হঠাৎই বাদ সেধেছে একটি ছোট্ট ঘটনা।

আমি বর্তমানে গবেষণার কাজে স্কটল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। পেন্টল্যান্ড পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়ানো যে অসাধারণ সুন্দর ক্যাম্পাসে আমি কাজ করছি, সেটি নতুন, ২০০৪ সালে চালু হয়েছে। । গত ৩রা মার্চ ক্যাম্পাসে যেতে বেশ খানিকটা দেরী হয়েছে, সকাল দশটার মতো। আর পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক সবকিছু, প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখা হলো অ্যাকাউন্টিং বিভাগের সিনিয়র লেকচারার পেনি গার্ডনারের সাথে। সদাখুশী এই ভদ্রমহিলাকে অন্যদিনের তুলনায় একটু কম খুশী মনে হলো, এক-দুই কথার পরেই জানতে চাইলেন ফায়ার এলার্মের সময় আমি কোথায় ছিলাম। আমি ছিলাম না শুনে জানালেন এই নিয়ে দু’বার হলো একটা ফায়ার এক্সিটের দরজা ব্লক ছিলো। কে একজন ওই দরজা ব্যবহার করতে গিয়ে বন্ধ পেয়েছে। রুমে ঢুকতেই রুমমেট ম্যালকম গ্রেগও জানালো দ্বিতীয়বারের মতো একটা ফায়ার এক্সিট ব্লক ছিলো। আমি বুঝতে পারলাম না এটি এতোবার বলার কী আছে, কারণ যখন-তখনই এই ফলস ফায়ার-এলার্ম দেয়া হয় ফায়ার এক্সিট ট্রেনিং-এর জন্য এবং সচরাচর কেউই ফায়ার এক্সিট ব্যবহার করে না, ম্যালকম বা পেনি তো নয়ই। সাধারণ সিঁড়ি এতো প্রশস্ত এবং এতোগুলো যে ফায়ার এক্সিট ব্যবহার করার প্রয়োজনই হয়না। তা’ছাড়াও একটা ফায়ার এক্সিট বন্ধ ছিলো তো কী হয়েছে একাধিক ফায়ার এক্সিট ছিলো। সন্ধ্যা পাঁচটার আগেই মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ অ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীনকে পাঁচ হাজার পাউন্ড ব্যক্তিগত জরিমানা করেছে কারণ ফ্যাকাল্টির ডীন হিসেবে এই ক্যাম্পাসের সেফটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাঁর। তবে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যাবে মার্চের শেষে এবং জরিমানা ওই রিপোর্ট অনুযায়ী নিশ্চিত করা হবে। বেচারা ডীন, প্রথমবার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হংকং ক্যাম্পাসে আর দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ৩রা মার্চ এই ঘটনার সময় ছিলেন স্কটিশ এক্সিকিউটিভের সাথে এক মিটিং-এ। গতকাল হঠাৎই বিশ্ববিদ্যালয়ের Job Vacancies ব্রাউজ করতে গিয়ে দেখলাম নতুন ডীনের জন্য

বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এটি কাকতালীয়ও হতে পারে তবে ম্যালকমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই ঘটনার সাথে যোগ আছে কী না, ম্যালকমের নির্বিকার উত্তর ছিলো, "মাইট হ্যাভ"। যাই হোক, ফায়ার এক্সিটের সেই বন্ধ দরজা খুলে গেছে ৩রা মার্চেই। কোথাও কোন উত্তেজনা ছিলো না, কাউকে উঁচু গলায় এ'বিষয়ে আলাপ করতে আমি অন্তত শুনিনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি প্রতিষ্ঠান একজন জনপ্রিয় ডীনকে তাঁর কাজের গাফিলতির জন্য ব্যক্তিগত জরিমানা করছে, বন্ধ দরজা তো খুলবেই। আমি এতোটা আশা নিশ্চয়ই করিনা বাংলাদেশে কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করে ঠিক কতজন পুড়ে কয়লা হলে পোষাক কারখানার গেটগুলো খোলা রাখতে আর ফায়ার এক্সিট বানানোর জন্য এসব কারখানার মালিকদের বাধ্য করা সম্ভব হবে। বাধ্য করা সম্ভব হবে সাধারণ বাসাবাড়ি নয় কারখানাতেই পোষাক ব্যবসা চালাতে। বাধ্য করাবেনই বা কে?

বাংলাদেশে পোষাক কারখানায় দুর্ঘটনার উপর ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এমন সব রিপোর্টেই আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি কী কারণ পাওয়া যায় এসব দুর্ঘটনার। নরসিংদীর চৌধুরী নিটওয়্যার (২০০০), মিরপুরের মিকো সোয়েটার, গ্লোব-নিটিং (২০০১), মিসকো সুপার মার্কেট (২০০৪), স্পেকট্রাম সোয়েটার পলাশবাড়ি (২০০৫), কেটিএস গার্মেন্টস (২০০৬), গাজীপুরের রেডিয়েন্ট ফ্যাক্টরি (২০০৬)- সব জায়গাতেই কারণ তো তিনটি এবং প্রথম থেকেই খুব ভালোভাবে চিহ্নিত। প্রথম কারণ মূল গেট বন্ধ থাকা, দ্বিতীয় কারণ হয় ফায়ার এক্সিট না থাকা অথবা থাকলেও ব্যবহার উপযোগী না হওয়া বা অন্যান্য জিনিসপপত্রের কারণে বন্ধ থাকা, তিন নম্বর কারণ দুর্বল অবৈধ স্থাপনা যা হঠাৎই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাজেই আগুন লাগলে, বয়লার ফেটে গেলে, আগুন লাগার গুজব ছড়িয়ে পড়লে কিংবা বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়লে প্রাণভয়ে ভীত মানুষগুলো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, আগুনে পুড়ে, হতভাগ্য সহকর্মীদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে এবং ভাঙ্গা বিল্ডিং-এর নীচে চাপা পড়ে থেকে উদ্ধারহীন মরে যায় বা খুন হয়। যে দুর্ঘটনার কারণ সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত হয়েছে ২০০০ সালে বা তারও আগে, সেই কারণেই ২০০৬ সালে লাশের মিছিল দীর্ঘতর হলে তাকে খুন না বলে উপায় কী! পায়ের তলায় চাপা পড়ে, আগুনে পুড়ে বা ভাঙ্গা বিল্ডিং-এর নীচে উদ্ধারের আশায় থেকে তিলে তিলে খুন হওয়ার বিষয়টা কি আমরা আসলেই বুঝি? না কি এসব কতগুলো শব্দমাত্র? ২৬ ফেব্রুয়ারী রয়টারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিজিএমইএ-র সভাপতি টিপু মুন্সী বলেছেন, "আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে...", প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৪০০০ হাজার কারখানাতেই বছরজুড়ে পাহারা দেয়ার। তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অসারতাকে প্রমাণ করতেই বুঝি ঠিক দশদিনের মাথায় রেডিয়েন্ট ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা।

আমার এক বাম ছাত্র সংগঠন করে আসা আইনের বন্ধু যিনি লন্ডনে বার করছেন বললেন কিছু করেই কিছু হবে না আর বেশী কিছু নাড়াচাড়া না করাই ভালো কারণ এমনিতেই বাংলাদেশের 'পোষাকশিল্প' আন্তজার্তিক বাজারে চাপের মধ্যে আছে। হায়, বালির মধ্যে মুখ গুজে থাকলেই যদি বালিঝড় থেকে রক্ষা পেতো মরুভূমির উট! আমার ক্যাম্পাসেরই অনেকে আমাকে সমবেদনা জানিয়েছে কেটিএস-এর দুর্ঘটনার পরে, অনেকেই জানতে চেয়েছে এটা কেনো বারে বারে হচ্ছে- আইন নেই না কি আইনের প্রয়োগ নেই। এরই মধ্যে একদিন সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ কমিটির প্রধান ডায়না উডওয়ার্ড (এক বছর রিসার্চ স্টুডেন্ট প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছি তাঁর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ কমিটিতে) ক্যাফেটারিয়ায় আমাকে দেখে নিজে থেকে অনেক কথা বললেন এই বিষয়ে, তার একটা কথা মনে গেঁথে আছে। বললেন হতাশ না হতে, বাংলাদেশের এখন যে অবস্থা ৬০/৭০ বৎসর আগে এখানকার মেয়েদের পরিস্থিতি, কারখানার পরিবেশ প্রায় ওইধরণেরই ছিলো। সরকার, বিভিন্ন সংস্থা সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নানা আইন-কানুন করেছে ঠিকই কিন্তু তার পেছনে সাধারণ মানুষের সার্বক্ষণিক দৃশ্য-অদৃশ্য চাপ, উদ্যোগ আর সতর্ক প্রহরা কাজ করেছে, এখনো করছে।

তাহলে কি আমাদের সামষ্টিক অ্যাপাথিই দায়ী এই ক্রমাগত খুনের জন্য? আমরা খুন হতে দিচ্ছি বলেই কি তারা খুন হচ্ছে? সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল (একমাত্র ব্যতিক্রম সিপিবি, তারা অন্তত আধা বেলার একটি হরতাল ডেকেছিলো), পেশাজীবী সংগঠন, সাধারণ মানুষ- কই, তেমন তো কোন প্রতিবাদ গড়ে উঠলো না! কেমন যেনো প্যারালাল এজেন্ডা সেটিং-এর মতোই শায়খ রহমান আর বাংলা ভাইয়ের নাটক শুরু হলো আর আমরাও মজে গেলাম সে নাটকে, অন্তত ৬০ জন শ্রমিকের সনাক্ত অযোগ্য পোড়া মৃতদেহ আর কয়েকশ' শ্রমিকের ঝলসে যাওয়া দেহ আমাদের অ্যাপাথিতে কোনই আঁচড় কাটতে পারলোনা।

১৯৯৮ সালের বন্যায় চাঁপাই নবাবগঞ্জে গিয়েছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠন 'রেটোরিক'-এর হয়ে সামান্য কিছু ত্রাণ নিয়ে। সেবার প্রথম এক রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিমূঢ় হয়ে

পড়েছিলাম। দেখেছিলাম, বন্যায় ভেসে যাওয়া পরিবারগুলো প্রাণপনে সব কাপড়-চোপড়, কাঁথা দিয়ে ঢেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে তাদের একমাত্র গরু বা ছাগলকে, ক্ষেত্রবিশেষে নিজের সন্তানকে খালি গায়ে রেখেই, কারণ বন্যার জল একদিন সরে যাবে তখন ফসলহীন, সম্বলহীন তাদের জীবনের একমাত্র ভরসা ওই গরু বা ছাগল, তাদেরকে ঘিরেই বন্যাপরবর্তী তাদের জীবীকা। আমাদের জাতীয় রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ, মতান্তরে ৮৫ শতাংশ (বিবিসি রিপোর্ট, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬) আসে এই পোষাক শ্রমিকদের শ্রমে-ঘামে। এই আয়ের বেনিফিশিয়ারী আমরা সবাই অথচ তাদের নিরাপত্তার কোন আয়োজন নেই। হা হা করা অভাবের এই দেশে পাঁচশ পোষাক শ্রমিকের মৃত্যু মালিক পক্ষের জন্য কোন পার্থক্য তৈরী করতে পারে না কারণ জ্বালানির মতোই আছে তাঁদের যোগান।

মানবিক যোগাযোগের শিক্ষার্থী হিসেবে হেইডার আর নিউকমের 'ব্যালান্স থিওরী' আমার দারুণ পছন্দ। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, কোন অসঙ্গতিমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মানুষ হয় সেই পরিস্থিতিকে মেনে নেয় নয়তো বদলাতে চেষ্টা করে জীবনে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে এই মৃত্যুগুলো আমাদের মধ্যে কোন অসংগতির বোধ আদৌ তৈরী করছে কী না। করে থাকলে আমরা কি আত্মসমর্পন করেছি নাকি পাল্টাতে চাই। যদি পাল্টাতে চাই, আমরা সবাই মিলে পারি কি বাধ্য করতে মালিকপক্ষকে কারখানার ন্যূনতম পরিবেশ নিশ্চিত করতে? গেটগুলো খোলা রাখতে? কার্যকর ফায়ার এক্সিটের ব্যবস্থা করতে? কী তার উপায়?

এবছর আন্তজার্তিক নারী দিবসে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, শ্রমবিকাশ কেন্দ্র আর অধিকার নামের একটি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিজিএমই'র সামনে প্রতিবাদ র‍্যালিসহ এক উদ্ভাবনী কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ৮ই মার্চ থেকে ১লা মে পর্যন্ত প্রতি বুধবার এই তিন সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল কালো কাপড় পরে বড় এক তালা নিয়ে অবস্থান করবেন বিজিএমই'র সামনে, বিকাল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। উদ্দেশ্য কারখানায় কাজ চলাকালীন সময়ে মূল গেট খোলা রাখার জন্য নৈতিক চাপ প্রয়োগ করা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগে শ্রমিক হত্যা প্রতিরোধ মঞ্চের ব্যানারে প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়েছে। এসব ছোট বড় অসংখ্য উদ্যোগ গড়ে উঠুক, গড়ে উঠুক জাতীয় বা আঞ্চলিক উদ্যোগ। গড়ে উঠতে পারে কি শহরে শহরে নাগরিক উদ্যোগ? নিজেকে দিয়ে বুঝি, সংবাদপত্র থেকে কোন ঘটনার পাট তুলে নিলে পাঠকের মন থেকেও ঘটনার গুরুত্ব হারিয়ে যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র জঙ্গী প্রশ্নে যে আপোষহীন ভূমিকা রেখেছে তার ফলেই বাংলা ভাই যে 'মিডিয়ার সৃষ্টি নয়, মিডিয়ার আবিষ্কার' সেটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো পোষাক কারখানার শ্রমিক নিরাপত্তার প্রশ্নেও যদি সেই আপোষহীন ভূমিকায় দাঁড়াতে রাজী হয় তবে হয়তো ছোট-বড় সব উদ্যোগ একত্রিত হয়ে ১৮ লাখ শ্রমিকের কাজের সময় বন্ধ মূল দরজা আর বদ্ধ ফায়ার এক্সিট মুক্ত হয়ে যেতেও পারে। কারখানা হয়ে উঠতে পারে কারখানই, মৃত্যুকূপ নয়। কে না জানে কসাইয়ের কাছে দয়া চেয়ে লাভ নেই, প্রয়োজন বাধ্য করা।

এডিনবরা, ১৬ মার্চ ২০০৬

কাবেরী গায়েন: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানবিক যোগাযোগ বিষয়ক গবেষক। ই-মেইল: kgayenbd@yahoo.com